# মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
## (M. K. GANDHI)

**প্রস্তাবনা**—ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধীর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর সারা জীবনের স্বপ্ন ও সাধনা ছিল দরিদ্র ও অনগ্রসর দেশবাসীর উন্নতিসাধন। তিনি কোন সুসংহত তত্ত্ব গড়ে তুলতে চাননি। আসলে তিনি তাত্ত্বিক ছিলেন না। তাই তাঁর রচনাকে কোন একটি মতবাদ হিসেবে অভিহিত করা যায় না। কোন তত্ত্ব-কাঠামো তৈরি করা তাঁর অভিপ্রায় ছিল না। বাস্তবিক পক্ষে তিনি ছিলেন একজন যথার্থ কর্মযোগী, কর্মের জগতেই তিনি বিচরণ করতেন। তিনি নিজে একথা অকপটে স্বীকার করে বলেছেন ঃ "I am not built for academic writings. Action is my domain"। অনেক চিন্তাবিদই "গান্ধীবাদ" (Gandhism) নামে একটি স্বতন্ত্র মতবাদের কথা বলে থাকেন। কিন্তু গান্ধীজী নিজেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, "গান্ধীবাদ বলে কোন কিছু নেই, আমার পরে আমি কোন গোষ্ঠী বা শ্রেণীকে রেখে যেতে চাই না। আমি কোন নতুন নীতি বা মতবাদেরও উদ্ভাবন করার দাবী করছি না। আমি কেবল আমাদের দৈনন্দিন জীবন ও তার সমস্যাবলীর উপর চিরন্তন সত্যগুলিকে আমার মতো করে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছি। আমার রচনাকে যদি ভণিতা করে দর্শন নাম দেওয়াও হয়, তাহলে আপনারা একে 'গান্ধীবাদ' বলবেন না, কেননা এর মধ্য দিয়ে কোন বাদই (ism) প্রচার করা হয়নি।" সনাতন ভারতীয় দর্শনের যে অখণ্ড (Synthetic) দৃষ্টিভঙ্গী, বস্তুতঃ তারই পরিচয় মেলে তাঁর রচনার মধ্যে। তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনে নীতিবিদ্যা, অর্থবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব মিলে মিশে রয়েছে। তাঁর রচনার এই বৈশিষ্ট্য 'জীবন' সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন। জীবনকে তিনি দেখেছিলেন তার পূর্ণ বা সামগ্রিক রূপে। তিনি জগৎকে দেখেছিলেন একজন অভিজ্ঞতাবাদী বা প্রত্যক্ষবাদীর দৃষ্টি দিয়ে; সত্যের একজন পরীক্ষক হিসেবে এটাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। তিনি সর্বদাই জগৎকে এবং যাবতীয় জাগতিক বিষয়াবলীকে অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতেই ব্যাখ্যা করেছেন। একজন চিন্তাবিদ্ হিসেবে তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ ছিল, তিনি জাগতিক অমঙ্গল ও তজ্জনিত সমস্যাবলীর ব্যবহারিক প্রতিকার নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই তিনি প্রয়োগবাদী (Pragmatic)



মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হন। আবার তিনি একজন ব্যবহারিক আদর্শবাদীও ছিলেন। এইরকম আদর্শের আলোকেই তিনি তাঁর চিন্তাকে কর্মে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। বর্তমান সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন তাঁর কাছে জরুরী বলে মনে হয়নি। বর্তমান মুহূর্তের কর্মই ছিল তাঁর আগ্রহ ও মনোযোগের বিষয়। তাৎক্ষণিক কর্ম সম্পাদনকে গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন— "I know only the moment's duty"। এই মনোভাব তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তায় ও দর্শনে প্রতিফলিত হয়েছে। গান্ধীজীর রচনাবলী পাঠ করলে যে কোন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিই লক্ষ্য করবেন যে, গান্ধীজী চেয়েছিলেন দেশের জনগণের নৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একটি সহযোগী শোষণমুক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা, তাই সেই লক্ষ্যসাধনে তিনি বিশ্বের প্রবলতম হিংস্র শক্তির বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগ বা সত্যাগ্রহের পথ অবলম্বন করার কথা বলদৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে হিংসার পথে কোন সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এই পথে সাময়িকভাবে স্বল্প পরিমাণে সুফল পাওয়া সম্ভব হলেও পরিণামে তার থেকে প্রতিহিংসাই জন্ম নেয়। এই ভয়াবহ হিংসা শক্তির সঙ্গে বিজ্ঞানের শক্তি যুক্ত হলে হিংসা যে ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী আকার ধারণ করে তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল সৃষ্টির সম্পূর্ণ বিনাশ। এই সর্বগ্রাসী হিংসা শক্তির কাছে মানুষ এক অসহায় জীব মাত্র। তাই হিংসার পথ বর্জন করতে হবে, সত্য ও অহিংসার পথ অবলম্বন করেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। এখন আমরা গান্ধীজীর জীবন ও দর্শনের কয়েকটি প্রত্যয় সম্পর্কে আলোচনা করবো।

### মানুষের স্বরূপ
### (Nature of Man)

গান্ধীজীর রাজনীতি সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী এবং সামাজিক ও ব্যক্তিগত নৈতিকতা সম্পর্কিত ধ্যানধারণা মানুষের স্বরূপ ও তার পূর্ণতা লাভের সক্ষমতার উপর দৃঢ়ভাবে নির্ভর করে রয়েছে। মানুষের আবশ্যিক স্বরূপ সম্পর্কে এক সুনির্দিষ্ট ধারণা নিয়েই তিনি শুরু করেছিলেন। কিছু ভ্রান্ত ধারণা, যেমন—'কি হয়েছে, 'কি হওয়া উচিত', 'কি হতে পারে' এবং 'প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জগতে মানুষের স্থান কোথায়' ইত্যাদি বিষয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব ভাবনা

ব্যক্ত করেছেন। সব রাজনৈতিক ও সামাজিক মতবাদেরই মানুষের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা দিয়ে শুরু করা উচিত, অন্ততঃ যতক্ষণ তা সমাজে তার নৈতিক লক্ষ্য ও আচরণকে প্রভাবিত করে। অবশ্য অনেক সমাজতাত্ত্বিক, এমনকি দুরখীমও (Durkheim) এ ব্যাপারে একমত হবেন না। এমনকি নৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক দার্শনিকদের অভিজ্ঞতাভিত্তিক আলোচনায় 'মানুষের স্বরূপ ও তার শক্তি' সম্পর্কিত স্বীকৃত বিষয়ের মধ্যেও কিছু মৌলিক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। তবে দর্শনের ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায় যে অনেকেই মানুষের স্বরূপ ও মর্যাদা সম্পর্কিত প্রশ্নে খুবই গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মুস্কিল হল, তাঁরা সকলেই এক একটি বিশেষ বিজ্ঞানের দ্বারা, বিশেষতঃ মনোবিদ্যা ও আধিবিদ্যক চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েই তাদের বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন।

নির্জ্ঞান মনের (unconscious mind) আবিষ্কারক ফ্রয়েড ও তাঁর অনুগামীরা অচেতন প্রবৃত্তি ও প্রবণতা বিশ্লেষণ করে মানুষের এক পূর্ণাঙ্গ ছবি তুলে ধরতে চেয়েছেন। এইরকম চিন্তাধারার সাহায্য নিয়ে আরো কিছু মনোবিদ্ মানুষকে কিছু মৌলিক ও আদিম তাড়না, আকাঙ্খা ও আবেগে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। আবার কোন কোন চিন্তাবিদ্ সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মানুষের স্বরূপ পর্যালোচনা করে বলেছেন যে মানুষ হল এক আত্মকেন্দ্রিক প্রাণী। হব্‌স (Hobbes) বলেন, সামাজিক তাড়নার দ্বারাই মানুষের স্বরূপ নির্ধারিত হয়। মানুষ মূলত একজন স্বার্থপর ব্যক্তি হিসেবেই নিজের সুখ-স্বাচ্ছ্যন্দের জন্য অন্যান্য মানুষের সঙ্গে উপযোজন (adjust) করার প্রয়োজন অনুভব করে এবং ফলশ্রুতি হিসেবে সে চুক্তি সম্পাদন করে যাকে সামাজিক চুক্তি (social contract) বলা যায়। আবার কোন কোন সমাজতাত্ত্বিক সম্পূর্ণভাবে সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতেই মানুষের স্বরূপের ব্যাখ্যা দিতে চান। এঁরা মানুষকে মূলতঃ এক সামাজিক জীব হিসেবেই গণ্য করেন যার সমাজ-ছাড়া অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এইসব চিন্তাবিদ্ তাই সামাজিক উপাদানগুলোর উপর জোর দিয়ে মানুষকে সম্পূর্ণভাবে তার সামাজিক অবস্থানে রূপান্তরিত করেছেন। কিছু অধিবিদ মনে করেন যে মানুষের স্বভাব বা স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে হলে তার আবশ্যিক (necessary) ও সাধারণ (common) বৈশিষ্ট্যগুলোকে আবিষ্কার করতে হবে। অ্যারিস্টটল মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন প্রাণী (rational animal)



বলে ব্যাখ্যা করেন যেহেতু এই বৈশিষ্ট্যটি অন্যান্য সব মানুষের মধ্যেই উপস্থিত। পরবর্তীপর্বে কিছু মানবতাবাদী ও কিছু অস্তিবাদী দার্শনিকবৃন্দ বলেন, শ্রেণী বৈশিষ্ট্য দিয়ে মানুষের বর্ণনা দেওয়া হলে তা কিন্তু সঠিক বর্ণনা হয় না, কেননা মানুষের ক্ষেত্রে সাধারণ বৈশিষ্ট্যের থেকেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ তার বিশেষত্ব বা অভিনবত্বের দিকগুলো। প্রতিটি ব্যক্তিই একদিক থেকে অনন্য (unique) এই অর্থে যে তার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলো একান্তভাবে তারই বৈশিষ্ট্য। অস্তিবাদীরা আরো মনে করেন, মানুষের কোন বর্ণনাই পূর্ণাঙ্গ বা পর্যাপ্ত হতে পারে না, যদি না তা মানুষের অভিনবত্বের দিকগুলোতে গুরুত্ব দেয়। মানুষের স্বরূপ সম্পর্কে এইসব বিভিন্ন মত প্রত্যেক চিন্তাবিদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর উপর প্রতিষ্ঠিত।

গান্ধীজী কিন্তু মানুষের এইরকম আংশিক, অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট (superficial) চিত্রে তৃপ্ত হননি। তিনি চেয়েছিলেন মানুষের এক পূর্ণাঙ্গ ছবি আঁকতে এবং তার মৌলিক সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করতে। গান্ধীজী বুঝেছিলেন যে, মানুষের যে চিত্র পূর্বোক্ত চিন্তাবিদ্‌রা তুলে ধরেছেন তা প্রধানতঃ মানুষের বাহ্যিক আচরণের এক অস্পষ্ট ছবি। এর থেকে অবশ্য মনে করা ঠিক হবে না যে মানুষের এই বাহ্যিক বা দৈহিক দিকের কোন সত্তা নেই বা মানুষের আপাত প্রতীয়মান চিত্রটি এক ভ্রান্ত চিত্র। মানুষের যথার্থ পরিচয় পেতে তার বাহ্যিক বা দৈহিকদিক কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। গান্ধীজী আসলে দেখাতে চেয়েছেন যে, এইসব মনস্তাত্ত্বিক, মনো--বিশ্লেষণাত্বক বা সমাজতাত্ত্বিক মতবাদগুলিতে মৌলিক বা প্রাসঙ্গিক বিষয়টি উপেক্ষিত বা বিস্মৃত থেকে গেছে।

গান্ধীজী মানুষকে এক জটিল সত্তা হিসেবে গণ্য করেছিলেন। তার দেহ প্রকৃতিরই এক অংশ এবং প্রকৃতি থেকেই এর উৎপত্তি। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে তার বিকাশ ও ক্ষয় হয়ে থাকে। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, পিতা-মাতার থেকেই দেহের জন্ম এবং যে মৌলিক মূলধন নিয়ে একটি শিশু তার জীবন শুরু করে তা তার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া; তার পরিবেশও এতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু মানুষ শুধু দেহ-সর্বস্ব নয়। মানুষের রয়েছে চেতনা, বিচারবোধ, বিবেক, ইচ্ছাশক্তি, আবেগ-অনুভূতি বা ওই জাতীয় গুণ ও শক্তি যেগুলো তার মধ্যে উপস্থিত আত্মার প্রকাশক বলে গণ্য করা হয়। 'দেহ ও আত্মা' এই দুটি চরম ও স্বনির্ভর সত্তা নয়। একমাত্র চিরন্তন

সত্তা হল ঈশ্বর, যিনি জড় ও চেতনা, দেহ ও আত্মা হিসেবে ভিন্নভাবে প্রকাশিত হন। এছাড়াও তার নান্দনিক বোধ, অনুভব ও সংবেদনশক্তি এবং ভাল-মন্দের স্বরূপ সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি—এগুলো নিছক তার দৈহিক ক্রিয়া নয়, বরং এগুলো সবই যথার্থ বা প্রকৃত মানুষের প্রকাশ—তার মধ্যে উপস্থিত আত্মার প্রকাশ।

মানুষের স্বরূপ সম্পর্কে গান্ধীজীর ধ্যান ধারণা তাঁর আধিবিদ্যক চিন্তাধারার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে আছে। তিনি দ্বৈতবাদী (Dualist) ছিলেন না, ছিলেন অদ্বৈতবাদী (Monist)। তাই একজন অদ্বৈতবাদী হিসেবে তিনি এক সর্বোচ্চ ঈশ্বরের সত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। আর এই বিশ্বাস থেকেই তিনি স্বীকার করেছিলেন যে জগতে যা কিছু আমরা দেখি তা সবই এই ঈশ্বরের প্রকাশ। এই দিক থেকে দেখলে মানুষকেও এক পরম সত্তার প্রকাশ বলে গণ্য করতে হবে। তার দৈহিক ও আধ্যাত্মিক—এই দুটি দিকই সেই একই সত্তার প্রকাশ। গান্ধীজীর মতে, দেহগত মানুষ হল আপাত বা প্রতিভাত মানুষ। তার দেহ প্রকৃতিগত যেহেতু তা অন্যান্য প্রাকৃতিক বস্তুর সদৃশ। গান্ধীজী মনে করেছিলেন যে, মানুষের আধ্যাত্মিক দিকটিই তার শ্রেষ্ঠ ও যথার্থ স্বরূপকে তুলে ধরে, এই আধ্যাত্মিক দিক তাকে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে আকৃষ্ট করে, যা বিশ্বের প্রতিটি মহৎ সংস্কৃতির এবং সকল মানবিক উন্নতির প্রধান ভিত্তিস্বরূপ। মানুষের এই আধ্যাত্মিক দিকটি অনুরাগ ও প্রবৃত্তির বাধা সত্ত্বেও নির্ভীকভাবে তাকে জীবনের প্রতিটি স্তরেই অন্যের মঙ্গলকামনায় অনুপ্রেরণা যোগায়।

গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন যে শুরুতে দৈহিক ও ভৌতিক দিকগুলোই বেশী প্রভাবশালী ছিল, কিন্তু প্রগতির অভিব্যক্তিতে ধীরে ধীরে তার আধ্যাত্মিক দিকটি উজ্জ্বলভাবে দেখা দিতে লাগল। এই যে অভিব্যক্তি বা বিবর্তন তা আসলে ভৌতিক থেকে আধ্যাত্মিক দিকে পরিবর্তন যার লক্ষ্য হল আধ্যাত্মিকতার সম্পূর্ণ উপলব্ধি, যার আর এক নাম দেবত্ব বা ঈশ্বরত্ব। এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে দৈহিক দিকটির যতই গুরুত্ব ও মূল্য থাক না কেন, মানুষের আসল স্বরূপ হল তার আধ্যাত্মিকতা। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই যে ঈশ্বরত্বের উপাদান রয়েছে তা স্পষ্টত প্রতীয়মান না হলেও মানুষের মধ্যে এই উপাদানটির উপস্থিতির প্রমাণ হল তার বিবেক, স্বাধীন ইচ্ছা, বিচারবোধ প্রভৃতি। গান্ধীজী মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে এইসব ঐশ্বরিক উপাদানগুলোকে সঠিকভাবে এবং সঠিক দিকে যদি প্রয়োগ করা যায় তাহলে মানুষ এই ধূলার পৃথিবীতে স্বর্গকে নামিয়ে আনতে



পারবে। গান্ধীজী মনে করতেন মানুষের এই আধ্যাত্মিক দিকটির সব থেকে বড় প্রমাণ হল প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে অনিবার্যভাবে শুভত্ব বা কল্যাণত্ব রয়েছে। মানুষ আপাতভাবে স্বার্থপর, এমনকি পাশবিক (brutist) মনস্ক হলেও আন্তর দিক থেকে এবং আবশ্যিকভাবে সে ভালো (good)। তিনি তাই বলেছেন—'আমি মানবিক স্বরূপকে সন্দেহ করতে পারি না। যে কোন মহৎ ও বন্ধুত্বপূর্ণ কাজে এটি অবশ্যই সাড়া দেবে।' এটি সম্ভব হয় মানুষের মধ্যে এরকম অনিবার্য উপাদানের উপস্থিতির জন্য যা নিজেই আধ্যাত্মিক এবং সব আধ্যাত্মিক উদ্দীপনায় সেটি সাড়া দেয়।

আমরা আগেই বলেছি যে গান্ধীজী ছিলেন একজন অদ্বৈতবাদী। ভারতে অদ্বৈতবাদের অন্যতম পুরোধা শঙ্করাচার্য মনে করেছিলেন যে, সব পরিবর্তন, বহুত্ব, নিছক প্রতিভাস (appearance) মাত্র। তাই তাঁর মতে, দেহ ও মন হল এক পরমসত্তা 'ব্রহ্মের' সসীম প্রতিভাস। তাই মনুষ্য সত্তার যথার্থস্বরূপ বুঝলে দেখা যাবে তা ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষের সসীমত্ব তার স্বরূপ সম্পর্কিত অজ্ঞতার জন্য। এই স্বরূপ জানতে পারলেই সে তার ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নতা অনুভব করতে পারে। ভারতে আর এক ধরনের অদ্বৈতবাদ দেখা যায় যা ঈশ্বরকে এক সর্বব্যাপী সত্তা হিসেবে স্বীকার করলেও সসীম ও বহুত্বকে নিছক প্রতিভাস বলে মনে করে না। বাহ্যবস্তু, দেহ, আত্মা সব কিছুকেই বাস্তব (real) বা যথার্থ বলে মনে করে যদিও এগুলো সসীম। মানুষের আবশ্যিক একত্ব (oneness) সম্পর্কে দৃঢ়বিশ্বাস গান্ধীজীকে নিশ্চিত করেছিল যে, প্রতিটি মানুষের মধ্যে অনিবার্যভাবেই আধ্যাত্মিক শুভত্ব রয়েছে। এই নিশ্চিত প্রত্যয় থেকেই গান্ধীজী বলেন—'আমি ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাস করি বলে মানবতায় বিশ্বাস করি। আমাদের অনেক দেহ রয়েছে কিন্তু আমাদের আত্মা একটিই। সূর্যের কিরণ বিচ্ছুরণের জন্য বহু বলে মনে হয়, যদিও তাদের উৎস একই।' ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে এই ঐক্য প্রকাশিত হয়ে থাকে এবং সব ধরনের কাজের পিছনে, তা সে ব্যক্তিগত বা সামাজিক বা রাজনৈতিক যাই হোক্ না কেন এই আধ্যাত্মিক নিয়ম ক্রিয়াশীল শুধু নয়, সব কিছুর মধ্যে ঐক্যবিধান করে চলেছে।

গান্ধীজী যে বিষয়টিতে জোর দিতে চেয়েছিলেন তা হল মানুষ তার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে যখন সে তার পশুসুলভ বৃত্তি বা পাশব সত্তা থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে পারবে। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে স্পষ্টভাবেই ঘোষণা

করেছেন যে পশুরা তাদের স্বভাববশতঃই কোন আত্মনিয়ন্ত্রণ মানে না, কিন্তু মানুষ এইজন্যই মানুষ যে, সে আত্মনিয়ন্ত্রণে সক্ষম। তিনি আরো বলেন যে পাপ বৃত্তিগুলোকে পরিত্যাগ করার ক্ষমতাই মানুষকে পশুদের থেকে আলাদা করে। যে পরিমাণ ও মাত্রায় সে অন্যান্য মানুষের জন্য কাজ করতে পারে সেই পরিমাণে সে মহৎ। একজন মানুষের সঙ্গে অন্য একজন মানুষের প্রভেদ জাতিগত দিক থেকে নয়, মাত্রাগত দিক থেকে। গান্ধীজী বলেন, সম্ভবত, আমরা প্রথমে পশুই ছিলাম, অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ার দ্বারা কালক্রমে আমরা এই পশু থেকে মানুষ হয়েছি।

গান্ধীজী মনে করেন উর্দ্ধাধোভাবে অবস্থিত দুটি ক্রিয়ার মধ্যে মানুষকে অবশ্যই একটিকে বেছে নিতে হবে—হয় উপরের দিকের নতুবা নীচের দিকের ক্রিয়াকে। যেহেতু মানুষের মধ্যে পশুসুলভ বৃত্তি রয়েছে তাই খুব সহজেই সে নীচের দিকের ক্রিয়াটিকে বেছে নেয়, বিশেষতঃ যখন সেই ক্রিয়া তার কাছে সুন্দর ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়। নিম্নপ্রবৃত্তি সব মানুষের মধ্যেই ধরা পড়ে। পশুর মধ্যে আত্মা (spirit) সুপ্ত হয়ে থাকে। দৈহিক শক্তি ছাড়া সে কোন নিয়ম মানে না। কিন্তু মানুষের মহত্ম বা মর্যাদা তাকে এক উচ্চতর নিয়মের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করায়। যখনই মানুষ তার অন্তরের সত্তা সম্পর্কে সচেতন হয়, তখন সে আর হিংস্র থাকতে পারে না। মানুষ ও পশুর মধ্যে অনিবার্য প্রভেদ হল মানুষ তার মধ্যে থাকা সত্তার ডাকে সাড়া দিতে পারে, তার মধ্যে থাকা পাশবিক প্রবৃত্তির (passion) উর্দ্ধে উঠতে পারে। তাই পশুসুলভ স্বভাব অর্থাৎ স্বার্থপরতা, হিংসা প্রভৃতির থেকে মানুষের অমর সত্তা শ্রেষ্ঠতর। গান্ধীজী বলেন—'আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করার জন্য আমাদের জন্ম। এটি বাস্তবিকই মানুষের বিশেষ প্রাপ্তি যা তাকে অন্যান্য জীবের থেকে পৃথক করে। যদিও মানুষ তার উৎপত্তিগতভাবে পশুসুলভ কিন্তু সুপ্তভাবে ও অনিবার্যভাবে সে ঐশ্বরিক। ঐশ্বরিক বলেই সে চিন্তা, অনুভূতি ও কাজের মধ্যে এবং তার সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে পারে।' এর থেকে এটি মনে করা ঠিক নয় যে গান্ধীজী মানুষের দ্বৈতবাদী মতবাদ উপস্থাপন করেছেন। বরং বলা যায় যে, মানুষ পশুও নয়, ঈশ্বরও নয়, সে 'মানুষ' যেহেতু তার নির্বাচন করার অনন্য ক্ষমতা রয়েছে। গান্ধীজীর মতে, মানুষ ঈশ্বরের মূর্তিতে গড়া এবং এই প্রতিরূপটির প্রতিফলন প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব ব্যক্তিসত্তায় দেখানো অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মানুষের পরম



লক্ষ্য হল ঈশ্বরের উপলব্ধি এবং তার সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি যাবতীয় কাজ ওই পরম লক্ষ্যের প্রতি ধাবিত হওয়া উচিত। ঈশ্বরকে খুঁজে পাবার একমাত্র পন্থা হল তাঁকে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দেখা এবং তাঁর সঙ্গে নিজেকে এক করে নেওয়া। গান্ধীজী বলেন—'আমি সমগ্রের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং বাকী মানব জাতিকে বাদ দিয়ে আমি তাঁকে খুঁজে পাব না'। গান্ধীজী আরোও বলেন, মানুষকে নিজেদের সঙ্গে সেই বন্ধনের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে যা তাদের সকলকে এক করে তোলে। সব মানুষের মধ্যে এই ঐক্যটি যদিও সাধারণ দৃষ্টির অগোচরে থাকে তবুও এটি ঘটনা যে তা 'বাস্তব' বা 'যথার্থ' (real)। গান্ধীজী বাস্তবিকপক্ষে একে অসংজ্ঞেয় (indefinable) এবং সর্বজনীন শক্তি (universal power) বলে মনে করেন যাকে মানবজাতি বা সমগ্র প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে বোঝা যায় না। প্রতিটি মানুষ সব পরিবর্তনের পিছনে নিহত এক অপরিবর্তনীয় ঐশ্বরিক শক্তির সেই অংশ যা সকলকে একসঙ্গে ধরে রাখে, যা সৃষ্টি করে, বিলীন হয়ে যায়, আবার সৃষ্টি করে।

প্রতিটি মানুষ কতকগুলো পরিবর্তনশীল স্বাভাবিক প্রবণতা নিয়ে এই পৃথিবীতে জন্ম নেয়। একই সঙ্গে সে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা নিয়েও জন্মায় যেগুলোকে সে জয় করতে পারে না। মানুষ তার অভ্যাস দ্বারা পরিচালিত হলেও তার ইচ্ছার দ্বারাই পরিচালিত হওয়া উচিত। মানুষ তাদের ইচ্ছাশক্তিকে এমন এক উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে যেখানে অন্যদের দ্বারা শোষণ একেবারে ন্যূনতম মাত্রার হতে পারে এবং যা আত্মশাসনে সক্ষম করে তোলে। মানুষের বিজয় নিহিত রয়েছে তার অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামের বদলে পারস্পরিক সেবা ও সহযোগিতার উপর। মানুষ শুধু অনুভূতিসম্পন্ন প্রাণী নয়, সে চিন্তাশীল প্রাণী। বিচারশক্তির সার্বভৌমত্বকে অন্ধ প্রবৃত্তির কাছে বিসর্জন দিলে একজন মানুষের সর্বস্ব পরিত্যাগ বোঝায়। গান্ধীজী তাই বলেন মানুষকে মন্দ বা অমঙ্গল শক্তি এবং ভাল বা মঙ্গলশক্তির মধ্যে বিচরণ করতে হয়, সে সর্বদাই লোভের শিকার। তাকে এইসব লোভের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, প্রতিহত করে তার মনুষ্যত্বের প্রমাণ দিতে হয়। তাঁর মতে প্রতিটি ব্যক্তিই অনন্য কেননা তার অভিনব দৈহিক ও মানসিক, উত্তরাধিকার ও সজ্জা (equipments) রয়েছে। একজন ব্যক্তি বর্তমানে যা, তা তার অতীতের কর্ম, চিন্তা, অনুভূতি ক্রিয়াকাণ্ডের অভ্যাসের ফল। মানুষ এইসব বিচিত্র কর্মের মধ্যে দিয়ে নিজেকে তৈরি করেছে।

এইরকম কর্ম বাহ্য ও আন্তর উভয়ই হয়ে থাকে। বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্রভাবে দেখলে তাদের তাৎপর্যহীন, মূল্যহীন বলে মনে হলেও সেগুলি একত্রিত করা হলে তা এক বিশাল শক্তির সৃষ্টি করবে যা তার স্বাস্থ্য, চরিত্র ও তার সমগ্র পরিণতি (destiny) নির্ধারণ করবে। গান্ধীজী এক জায়গায় লিখছেন—আমি বিশ্বাস করি যে মানবশক্তির সমষ্টি আমাদের নীচের দিকে নামাবে না, বরং উপরের দিকে নিয়ে যাবে এবং যা অচেতন হলেও সুনির্দিষ্ট প্রেমের সক্রিয়তার ফলশ্রুতি। তিনি মনে করেন, মানুষের মধ্যে যে ঈশ্বরের উপস্থিতি রয়েছে তা এই বিশ্বাসকেই দৃঢ়তর করে যে, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা, বিচারবোধ, বিবেক এবং ভালবাসা বা প্রেম রয়েছে। মানুষ তার নিজের পরিণতি নিজেই ঠিক করে। যদি সে সঠিক ভাবে তার বিচারবোধকে প্রয়োগ করার জন্য নির্বাচন করতে পারে এবং তার বিবেকের বাণী (যা ঈশ্বরের আন্তরবাণী) শুনে জীবনকে পরিচালিত করতে পারে এবং তার হৃদয়ের ভালোবাসা দিয়ে তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে বসবাস করতে পারে তাহলেই সে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারবে; ব্যর্থতার মধ্যেও সাফল্যের সোপান বলে বিবেচনা করে নিজেকে উন্নত করতে শিখবে এবং এই পৃথিবীকে সুন্দর করে তুলতে পারবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে মানবের প্রগতির পথ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন—প্রগতির পথ অনুসরণ করতে মানুষকে অবশ্যই প্রতিনিয়ত তার জীবনকে উন্নত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে—আর এই প্রচেষ্টা তার নৈতিকতা, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতির উন্নতির জন্য।

## অহিংসা
## (Non-Violence)

গান্ধীজীর জীবনে অহিংসা নীতির গুরুত্ব কতখানি তা বোঝা যাবে যদি আমরা তাঁর একটি উক্তি স্মরণ করি—"Non-violence is the first article of my faith. It is also the last article of my creed"—অর্থাৎ "অহিংসাই আমার প্রথম ও শেষ ধর্মবিধি, ধর্মমত।" এই নীতিটির প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য তাঁর জীবনের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। তাই শুধু নিজের জীবনে নয়, তিনি চেয়েছিলেন গোষ্ঠীর কার্যাবলীতেও এই মহান আদর্শের প্রতিফলন ঘটুক। জনসাধারণের সকল কার্যকলাপ পরিচালিত হোক সত্য ও অহিংসার নীতির দ্বারাই।



সনাতন ভারতীয় চিন্তায়ও 'অহিংসার' ধারণাটি চিরদিনই শ্রদ্ধা ও সংভ্রমের দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। বৈদিক যুগের পূজার্চনায় প্রাণী হত্যার বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হিসেবেই হয়ত এই ধারণা জন্ম নিয়েছিল। পরবর্তীকালে এই ধারণাটি তাৎপর্য ও পরিধির দিক থেকে বিস্তৃতি লাভ করেছিল এবং আরো পরবর্তীকালে দেশের জনগণের বৌদ্ধিক জীবনে একটি প্রাণশক্তি রূপে বিকশিত হয়েছিল। উপনিষদের কাল থেকে জীবিত প্রাণীদের, অর্থাৎ মানুষ ও জীবজন্তুদের অনাঘাত বা অহিংসাকে একটি মহৎ আদর্শ হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে। জৈন ধর্মের সমস্ত উপদেশের মধ্যেই অহিংসার মন্ত্রটিকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা যায়, কেননা এই ধর্মানুসারে মুক্তি লাভের জন্য "ত্রিরত্ন" সাধনার প্রয়োজন। এই তিনটি রত্ন হল—জ্ঞান, শ্রদ্ধা ও চরিত্র। আর এই চরিত্র গড়ে ওঠে অহিংসা, সুনৃত প্রভৃতি গুণের দ্বারা। এখানে 'অহিংসা' বলতে অসতর্ক বা অমনোযোগী হয়েও কোন জীবনহানি না করা বোঝায়। বৌদ্ধ ধর্মে নির্বাণকে আদর্শ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এই নির্বাণ লাভের অন্যতম প্রধান পন্থা হল অহিংসা। করুণা, প্রেম ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য নিয়েই 'অহিংসা' নামক পন্থাটি গড়ে ওঠে। হিংসা দিয়ে ওই মহান লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। গান্ধীজীর অহিংসার ধারণায় শ্রীমদ্‌ভগবত গীতার প্রভাব ছিল সর্বাধিক। যে অহিংসাকে তিনি সত্যের চরম ফুল বলে মনে করতেন, তার উৎস হিসেবে তিনি গীতাকেই পরমশ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তবে গীতার আগের যুগ থেকেই অহিংসাকে প্রাথমিক কর্তব্য বলে বিবেচনা করা হয়েছিল। গীতার প্রধান উপদেশ হল অনাসক্তি বা স্বার্থবিহীন কর্ম, যাকে আত্মনুভবের পন্থা বলা যায়।

গান্ধীজী যে সত্যাগ্রহ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল সকলের সঙ্গে একযোগে সত্যের আরাধনা করা। "তাঁর আশ্রমের বাসিন্দা সকলেই ছিলেন সত্যাগ্রহী অর্থাৎ অহিংস সৈনিক। সৈনিকের মতোই তাঁদের স্বেচ্ছায় কঠোর জীবনযাপন করতে হতো। গান্ধীজী আশ্রম-কর্মীদের পালনের জন্য ১১টি ব্রতের প্রবর্তন করেছিলেন। এর মধ্যে যে প্রথম পাঁচটি মহাব্রত বৈদিক যুগ থেকেই ভারতীয় সমাজজীবনে অবশ্য পালনীয় ব্রত রূপে প্রচলিত ছিল, তাহল—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ।"[১] অহিংসা ও সত্যের গুরুত্ব গান্ধীজীর জীবনে এবং দর্শনে কতখানি ছিল তা (২৯শে জুলাই ১৯৩০) য়েরোড়া মন্দিরে

১। বিধুভূষণ দাশগুপ্ত অনূদিত 'মঙ্গলতপ্রভাত'।

প্রাতঃকালীন প্রার্থনার শেষে তিনি উল্লেখ করেছেন—"সত্য ও অহিংসার পথ যেমন সহজ তেমনি কঠিনও বটে। এ যেন তলোয়ারের ধারের উপর দিয়ে চলা। যে খেলোয়াড় শূন্যে দড়ির উপর চলার খেলা দেখায় সে সতর্ক হয়েই চলে থাকে, কিন্তু সত্য ও অহিংসার রশি এর চাইতেও সূক্ষ্ম, একটু অসতর্ক হলেই আর কথা নেই, একদিকে পড়ে যেতে হবে। প্রতি মুহূর্তের সাধনা দ্বারা সত্য ও অহিংসার দর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো অহিংসার পথে যে কষ্ট তা সহ্য করা হবে, না যে কষ্ট দেয় তাকে বিনাশ করে এগিয়ে যাওয়া হবে? জিজ্ঞাসু দেখতে পাবেন—বিনাশ করে চললে তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানেই থাকবেন, এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা খুঁজে পাবেন না। সংকট সহ্য করেই এগিয়ে যেতে হবে।...কিন্তু কোন উপদ্রব সহ্য করাই যথেষ্ট নয়। এর থেকে ভীরুতার সৃষ্টি হয়।...এই অহিংসার পথে উত্তরোত্তর দুঃখ সহ্য করার কথা এসে যায়। এর জন্য অটুট ধৈর্য শিক্ষা করার কথা এসে পড়ে।...এই অহিংসা সেই স্থূল বস্তু নয় যা আমরা সচরাচর দেখে থাকি। কুচিন্তা মাত্রই হিংসা। উত্তেজিত হওয়া হিংসা, মিথ্যা-ভাষণও হিংসা, দ্বেষও হিংসা। কারুর মন্দ ইচ্ছা করাও হিংসা। জগতের যে বস্তু সকলের জন্য, তার উপর ব্যক্তিগত অধিকার বলবৎ রাখাও হিংসা।...একটি কথা সকলেরই বুঝে নেওয়া দরকার যে অহিংসা ছাড়া সত্যের অনুসন্ধান অসম্ভব। অহিংসা ও সত্য এমন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত যে তা একটা টাকার এপিঠ ওপিঠের মতো, যেদিকেই উল্টানো যায় টাকা টাকাই থেকে যায়। তাহলেও অহিংসাকে সাধন এবং সত্যকে সাধ্য বলে বুঝতে হবে। সাধন আমাদের হাতের জিনিষ, সেইজন্য অহিংসাকে পরমধর্ম বলে মানা হয়েছে।...সত্য আছে, এক সত্যই আছে, সত্যই এক পরমেশ্বর। তাঁর সাক্ষাৎ লাভের পথও একটিই। একটিই মাত্র সাধন, তা হল অহিংসা। তাকে কখনও ছাড়বো না। যে সত্যরূপী পরমেশ্বরের নামে এই প্রতিজ্ঞা করছি, তিনিই তা পালন করার শক্তি দিন।"

গান্ধীজী লিখছেন—"কয়েকজন বন্ধু আমাকে বলেছেন যে রাষ্ট্রনীতি এবং জাগতিক বিষয়ে সত্য ও অহিংসার কোন স্থান নেই। আমি এর সঙ্গে একমত নই। ব্যক্তির মুক্তির পন্থা হিসেবে এদের কোন স্থান আমার কাছে নেই। দৈনন্দিন জীবনে এদের প্রয়োগ এবং ব্যবহারই আমার সর্বক্ষণের পরীক্ষণ।" এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেছেন—"সত্য ও অহিংসাকে নিছক ব্যক্তির অনুশীলনের বিষয় রূপে না রেখে তাদের গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও জাতীয় বিষয়ে পরিণত করতে হবে। এটাই যে-কোন



মূল্যে আমার স্বপ্ন। এটিকে অনুভবের প্রচেষ্টায় আমি বাঁচব এবং মরব। আমার এই বিশ্বাস প্রতিদিনই নতুন নতুন সত্যকে আবিষ্কার করতে সাহায্য করছে। অহিংসা হল আত্মার ধর্ম এবং তা সকলের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুশীলন করতে হবে। সমস্ত ক্ষেত্রে যদি এর অনুশীলন না করা যায় তবে এর কোন ব্যবহারিক মূল্য নেই।" গান্ধীজীর মতে সত্যের ও অহিংসার ধারণা অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। অহিংসা ছাড়া সত্যের অনুসন্ধান ও আবিষ্কার সম্ভব নয়। এ দুটি এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে কোনভাবেই তাদের অসম্পৃক্ত রাখা ও বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। তাঁর মতে যেহেতু সত্য হল লক্ষ্য এবং অহিংসা হল পন্থা, তাই পন্থাকে পেতে হলে তা আমাদের আয়ত্ত্বাধীন হতে হবে। কাজেই অহিংসা হল আমাদের চরম কর্তব্য। তিনি তাই বলেন— "If we take care of the means, we are bound to reach the end sooner or later. When once we have grasped this point, final victory is beyond question".

অহিংসার স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে গান্ধীজী অহিংসার সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে—"চরমতম স্বার্থহীনতা। স্বার্থহীনতা বলতে বোঝায় নিজের দেহ সম্পর্কে শ্রদ্ধা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি। যদি মানুষ নিজেকে অর্থাৎ সত্যকে অনুভব করতে আকাঙ্খী হয়, তাহলে দেহ থেকে সম্পূর্ণরূপে আসক্তিশূণ্য হয়েই একমাত্র করা সম্ভব। অর্থাৎ অন্যদেরও এই অনুভূতি জাগাতে হবে যে তা থেকে তারা নিরাপদ। এই হল অহিংসার পথ"। গান্ধীজী আরো বলেছেন—"অহিংসা কেবলমাত্র হত্যাহীনতা বা অ-বধ (non-killing) বোঝায় না। হিংসা বলতে বোঝায় কষ্ট দেওয়া বা ক্রোধবশতঃ স্বার্থযুক্ত উদ্দেশ্যে অন্যের জীবন হানি করা বা আঘাত দেবার উদ্দেশ্যে তা করা। এই সব করা থেকে বিরত থাকাই অহিংসা।"

গান্ধীজীর উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে হয়ত মনে হতে পারে যে, 'অহিংসা' একটি নেতিবাচক বিষয়, এর মধ্যে ইতিবাচক কোন উপাদানই নেই। কিন্তু এ ধারণা যে কতখানি ভুল, তা বোঝা যায় যখন আমরা গান্ধীজীর অন্য একটি উক্তির প্রতি দৃষ্টি দিই। তিনি বলেছেন যে "অহিংসা-ক্ষতিকরহীনতা নামক নিছক নেতিবাচক অবস্থা নয় বরং প্রেম নামক ইতিবাচক অবস্থা, অমঙ্গলকারীরও মঙ্গল সাধন করা। ইতিবাচক দিক দিয়ে অহিংসা হল পরম বা বৃহত্তর প্রেম, মহত্তের বদান্যতা (charity)। যদি আমি অহিংসা অনুসরণকারী হই, আমাকে অবশ্যই আমার শত্রুকেও ভালবাসতে হবে। ভ্রমকারক বা ক্ষতিকারক যদি পিতা বা পুত্র হয় তার

প্রতি যে নীতি অনুসরণ করবো, ক্ষতিকারক যদি আমার শত্রু অথবা আমার অপরিচিত হয় তার প্রতিও সেই একই নিয়ম প্রয়োগ করব। এই রকম সক্রিয় অহিংসার মধ্যে রয়েছে সত্য ও ভীতিশূন্যতা।...কোন একজন ভীরু মানুষ অহিংসার অনুশীলন করতে পারে না, অহিংসার অনুশীলন দাবী করে মহত্তম সাহস"।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, গান্ধীজী যে অহিংসা নীতির কথা বলেছেন তার বৈশিষ্ট্য হল, এটি সক্রিয়। পরাক্রমশালী অহিংসার এই গতিময় ও কর্তৃত্বমূলক বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়ে যখন দেখি সত্যাগ্রহ নামক গোষ্ঠীক্রিয়া যা কৌশল হিসেবে অহিংসার উপর নির্ভর করে আছে।

সত্য ও অহিংসার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে তিনি যমুনালাল বাজাজকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। তাতে তিনি বলছেন—"যখন আমি সত্যের সন্ধানে অগ্রসর হই, এটি আমার মধ্যে বিকাশ লাভ করে যে সত্যের মধ্যে সবকিছুই নিহিত। এটি অহিংসা নয়, বরং অহিংসা এর মধ্যেই রয়েছে। বিশুদ্ধ হৃদয় ও বুদ্ধি যাকে প্রত্যক্ষ করে তাহল তাৎক্ষণিক সত্য। সেটিকেই আঁকড়ে থাক, এটিই ব্যক্তিকে বিশুদ্ধ সত্যের কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করবে। ভাগ করা কর্তব্য বলে সেখানে কিছু নেই, কিন্তু মাঝে মাঝেই অহিংসা কি তা নির্ণয়ে অসুবিধার সৃষ্টি হয়... হিংসার জগতের মধ্যেই আমাদের অহিংস জীবন যাপন করতে হবে এবং তা সম্ভব হয় যদি আমরা সত্যকে আঁকড়ে থাকি। এইভাবেই আমি সত্য থেকেই অহিংসাকে অনুসৃত করে থাকি। সত্য থেকেই প্রেমের নমণীয়তা, বিনয় প্রভৃতির উৎপত্তি হয়ে থাকে। সত্যের পূজককে (Votary) ধূলির মত বিনয়ী হতে হবে। সত্যের অনুসরণের সঙ্গে বিনয়ের বৃদ্ধি সাধন হতে থাকে।"[১]

কেউ কেউ মনে করেন যে গান্ধীজী অহিংসার চেয়ে সত্যকেই বেশী মূল্য দিয়েছিলেন এই ভাবনা থেকে যে, সত্য দেশ ও কালকে অতিক্রম করে শর্তহীন হয়েও অস্তিত্বশীল; কিন্তু অহিংসা কেবলমাত্র সসীম জীবের অংশ বিশেষের মধ্যেই উপস্থিত। সত্যের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন হয়ে যে অহিংসা, তা অনৈতিকতারই নামান্তর। তিনি সত্যের জন্য অহিংসাকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু অহিংসার জন্য সত্যকে ত্যাগ করতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু কোন বিতর্কে না গিয়েও একথা বলা যায় যে, সত্য ও অহিংসা শুধু ঘনিষ্ঠ

১। তদেব।



সম্পর্কেই যুক্ত নয়, তারা পরস্পরের পরিপূরক। লক্ষ্যণীয় যে, 'অহিংসা' নামক প্রত্যয়টির মধ্যে সামর্থ্যের একটি পূর্ব স্বীকৃতি রয়েছে। যার কোন বিষয়ে কোন সামর্থ্য ও শক্তি নেই সে কি করে অহিংস হবে? নির্ভীকতা, সাহস, শক্তি, দৃঢ়তা ইত্যাদি অহিংসার অনিবার্য ও আবশ্যিক গুণ। তাই অহিংসা ভীরুদের অস্ত্র নয় বরং সাহসীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন— "Man for man, the strength of non-violence is in exact proportion to the ability, not the will of the non-violent person to inflict violence"।

গান্ধীজীর অহিংসার ধারণার মধ্যে কয়েকটি স্তরের কথা কেউ কেউ বলে থাকেন। এই স্তরগুলো মূলত তিন ধরনের—***সর্বোচ্চ স্তর*** হল সাহসীদের অহিংসা। এটি কোন তাগিদে গৃহীত পন্থা নয় বরং একমাত্র নৈতিকতাবোধ দ্বারা তাড়িত হয়েই অনুসরণ করা হয়। কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের যে কোন ক্ষেত্রেই এই ধরনের অহিংসা কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। ***দ্বিতীয় ধরনের*** অহিংসা হল দুর্বলদের ও অসহায়দের অহিংসা। জীবনের কয়েকটি ক্ষেত্রে দ্রুত ফললাভের প্রত্যাশায় দৃঢ় নীতি হিসেবে এটিকে অনুসরণ করা হয়। যদি সততার সঙ্গে কৌশলের সঙ্গে, এটিকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয় তাহলে হয়ত কিছু ক্ষেত্রে তা ফলদায়ী হতে পারে। কিন্তু যেহেতু এটি নৈতিকতাবোধ বা অন্য কোন বিবেচনার উপর প্রতিষ্ঠিত নয় তাই প্রথম ধরনের অহিংসার মতো ফলপ্রসূ নয়। তাছাড়া এটি কোন কোন ক্ষেত্রে হিংসারও অনুমোদন করতে পারে। ***তৃতীয় ধরনের*** অহিংসা হল ভীরু ও নারীদের। কিন্তু গান্ধীজীর মতে এই ধরনের অহিংসাকে প্রকৃত অর্থে অহিংসা বলা যায় না। কেননা যে অহিংসার মধ্যে সাহসিকতার অভাব থাকে তা অহিংসা নয়। তিনি তাই বলেন— "Cowardice and Ahimsa do not go together any more than water and fire." বিপদের মুখোমুখি না হয়ে বিপদ থেকে দূরে সরে যাওয়া বা পালিয়ে যাওয়া; সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা না করা—এই ধরণের অসম্মানজনক, অস্বাভাবিক পলায়নকে অহিংসা না বলে বরং নিষ্ক্রিয় হিংসা বলাই শ্রেয়। অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করে অহিংস হওয়া, এর থেকে হিংস্র হওয়া বরং শ্রেয়। তিনি তাই বলেন—"It is better to be violent if there is violence in our breast than to put on the cloak of non violence to cover impotence" তাই, একথা মনে করলে মারাত্মক ভুল হবে যে, অহিংসার পন্থা

কেবল সাধু-সন্ন্যাসী, নিরীহ ও ভীরুদেরই আচরণীয় বিধি। গান্ধীজী শুধু ব্যক্তিজীবনে নয়, গোষ্ঠী ও সমষ্টি জীবনেও এর প্রয়োগের কথা বারে বারেই বলেছেন। তিনি নিঃসংশয় ছিলেন যে পরিণামে অহিংসার জয় অবশ্যম্ভাবী। হিংসার পথে যে সাফল্য আসে তা নিতান্তই সাময়িক, তা কখনও স্থায়ী সাফল্য এনে দিতে পারে না।

অহিংসাকে নীতি হিসেবে শ্রদ্ধা জানিয়েও কেউ কেউ এটিকে পন্থা হিসেবে মেনে নিতে আপত্তি জানাতে পারেন। তাঁরা বলতে পারেন যে ব্যক্তিজীবনে এটি আচরণীয় বিধি হিসেবে গ্রহণ করা গেলেও সমষ্টি জীবনে এর প্রয়োগ ও অনুসরণ প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া সমষ্টিজীবনে এর অনুসরণ ভীরু ও কাপুরুষের বিধি বলেই মনে হতে পারে। কিন্তু গান্ধীজীর রচনাবলী যত্ন সহকারে পাঠ করলে এই সব সমালোচনাকে বিভ্রান্তিকর বলে মনে হবে। 'অহিংসা' নামক প্রত্যয়টিকে তিনি যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন তার যথার্থ মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে যে, সমালোচকরা তাঁর বক্তব্যের সঠিক ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ভীরুতা ও দুর্বলতাকে তিনি কখনও অহিংসার সঙ্গে যুক্ত করতে চাননি। বরং এটিকে সাহসী ও শক্তিশালীদের অনুসৃত বিধি হিসেবেই তিনি গণ্য করেছেন।

## সত্যাগ্রহ
## (Satyagraha)

'গান্ধীজী' ও 'সত্যাগ্রহ' নাম দুটি প্রায় সমার্থক বলেই মনে করা হয়ে থাকে। সত্যাগ্রহকে গান্ধীজীর এক পরম সৃষ্টি ও আবিষ্কার বলা যায়। কিন্তু 'সত্যাগ্রহ' কী? এই শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল, সত্যের সঙ্গে যুক্ত (আবদ্ধ) হয়ে থাকা (holding on to truth) ; এর দ্বারা সত্যের প্রতি সর্বদাই এক জটিল, অবিচল আনুগত্য দেখানো হয়। এটিকে তাই সত্য-শক্তি (truth-force) বলেই গণ্য করা হয়। গান্ধীজী নিজে একে প্রেম-শক্তি (love-force) বলে মনে করেন কেননা সত্যের উপর নির্ভর করে যেসব আচরণ সম্পাদিত হয় তা প্রেম ছাড়া সম্ভব নয়। সত্যাগ্রহকে আত্মা-শক্তি (soul-force), আত্ম-শুদ্ধি (self-purification) নামেও অভিহিত করা হয়। সত্যাগ্রহ হল অহিংস পথ, এক নৈতিক অস্ত্র যাকে সসস্ত্রশক্তির বিপরীত হিসেবেই গণ্য করতে হবে। প্রকৃত অর্থে দেখতে গেলে সত্যাগ্রহ এক ধরনের শিক্ষা—জনগণের জাগরণ এবং শিক্ষার সব থেকে



গুরুত্বপূর্ণ উপায় হল সত্যাগ্রহ। যে বিশ্বাসের উপর এই প্রত্যয়টি দাঁড়িয়ে আছে তাহল, সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সত্যের উপর নির্ভরশীল। তাই যাকিছু অসত্য তা অস্তিত্বহীন। সত্য মানে 'যা আছে'; তাই অসত্য যদি সত্যের মতো না হয়, তাহলে তার জয়ী হবার কোন প্রশ্নই ওঠে না, এবং সত্য অস্তিত্বশীল বলে, তার কখনো ধ্বংস হতে পারে না।

'সত্য কী?' সত্য শব্দটি উৎপত্তি হয়েছে 'সৎ' শব্দ থেকে। 'সৎ' কথার অর্থ অস্তিত্ব। সেইজন্য সত্য ছাড়া আর কোন কিছুকেই অস্তিত্বশীল বলা যায় না। ঈশ্বরই এই অর্থে একমাত্র সত্য। সত্য শুদ্ধ জ্ঞান ও শাশ্বত আনন্দ স্বরূপ।' "সাধারণতঃ সত্য মানে সত্য কথা বলাই আমরা বুঝে থাকি। কিন্তু এখানে 'সত্য' শব্দটি ব্যাপক অর্থেই প্রয়োগ করা হচ্ছে। বিচারে, বাক্যে, আচরণে—সত্যই প্রকৃত সত্য। এই সত্যকে যিনি সম্পূর্ণভাবে জানতে পেরেছেন জগতে তাঁর কিছুই জানার আর বাকী নেই।...সত্যের মধ্যে যা নেই তা সত্য নয়, তা জ্ঞান নয়, তা আনন্দই বা হবে কেমন করে? এই উপলব্ধি যদি আমরা প্রয়োগ করতে শিখি তবে আমরা বুঝতে পারব কোন প্রবৃত্তিটা আচরণের যোগ্য আর কোন্‌টা ত্যাজ্য। কোন্‌টা দেখার যোগ্য কোন্‌টা নয়, কোন্‌টা শোনার যোগ্য কোন্‌টি নয়।... যে ব্যক্তি সত্যকে যেমনভবে দেখে বা অনুভব করে সে যদি সেই অনুযায়ী আচরণ করে তাতে দোষের কিছু নেই, এবং তেমনি আচরণ করাই তার কর্তব্য।... এমনি নিঃস্বার্থভাবে সত্যের অনুসন্ধান করে কোন লোক শেষ পর্যন্ত ভুল পথে যায় না। সাময়িকভাবে ভুল পথে গেলেও ধাক্কা খেয়ে আবার ঠিক পথেই সে ফিরে আসে। সত্যের আরাধনাই ভক্তি।"

গান্ধীজী সত্যের দুটি রূপ স্বীকার করেছিলেন, একটি হল চরম, সার্বিক ও অসীম সত্য। 'সত্য' এই অর্থে মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্যবস্তু। সত্যের অন্য রূপটি হল অঙ্গীকার বা শপথ বা পন্থা। এই অর্থে সত্য সাপেক্ষ। সত্য তার চরম ও অসীম রূপে ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন। একজন মরণশীল জীব হিসেবে, একজন দেহধারী মানুষ হিসেবে চরম সত্যের মুখোমুখি আমরা হতে পারি না। যেহেতু এই সত্য চিরন্তন বা নিত্য, তাই যতক্ষণ না চরম সত্য লাভ করা যাচ্ছে ততক্ষণ এই সাপেক্ষ সত্যকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। যেহেতু মানুষের পক্ষে পূর্ণাঙ্গ সত্যের পরিচয় লাভ করা সম্ভব নয়, তাই সত্যকে যে রূপে দেখা যায়, সেইভাবে জীবন যাপন করাই কর্তব্য। এইভাবে জীবন যাপন করতে গিয়ে এক পবিত্র

পন্থার আশ্রয় নিতে হয়, তার নামই অহিংসা। গান্ধীজী বলেন, সত্যের পরিচয় বইতে পাওয়া যাবে না, কেননা সত্য প্রতিটি মানব হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। সেখানেই তাকে চিনে নিয়ে সেই অনুসারে চলতে হবে। গান্ধীজীর কাছে সত্য হল লক্ষ্য এবং অহিংসা হল সেই লক্ষ্যলাভের পন্থা বা উপায়। 'সত্য' ও 'অহিংসা' প্রত্যয় দুটি গান্ধীজীর কাছে এমনই সম্পর্কযুক্ত যে, তিনি মাঝে মাঝে এদের অভিন্ন বলেও গণ্য করেছেন। প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যকে দেখে বলে দাবী করতে পারে না যে, তার দেখা রূপটিই সত্যের আসল রূপ। তাই অন্যের দেখা রূপকে গ্রহণ করার মানসিকতাও থাকা দরকার, কেননা অন্য ব্যক্তির দেখা রূপটিও তো তার কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছে। এইভাবেই অন্য মতের প্রতি সহনশীলতা জন্মায় এবং এটিই অহিংসার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

গান্ধীজীর জীবন দর্শন এবং অমঙ্গলের বিরুদ্ধে তাঁর বিরোধিতার পদ্ধতি—এই দুটিকেই 'সত্যাগ্রহ' নামে অভিহিত করা যায়। 'সত্যাগ্রহ' কথাটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা এর যথার্থ তাৎপর্য বুঝতে অসুবিধার সৃষ্টি করে। কেন না কেউ কেউ এর একটি দিকে গুরুত্ব দিয়ে একজন সত্যাগ্রহীর জীবন যাপনের রীতিকে বোঝাতে পারেন। যেমন বলতে পারেন যে, সত্যাগ্রাহী হবেন নিরামিষাশী, তিনি ব্রহ্মচর্য পালন করবেন, অপরিগ্রহের (কোন কিছু না রাখার) অনুশীলন করবেন ইত্যাদি। কিন্তু সত্যাগ্রহকে এইভাবে দেখলে তাকে নিছকই নৈতিক নীতি হিসেবে দেখা হয়।

সত্যাগ্রহ গান্ধীজীর কাছে ছিল বৃটিশরাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথ। বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আর এক নাম হল সত্যাগ্রহ। যাবতীয় অমঙ্গলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পদ্ধতি, সব দ্বন্দ্বের সমাধানের কৌশল হল এই সত্যাগ্রহ। সত্যাগ্রহকে শুধু প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ হিসেবে না দেখে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের ও মৌলিক পরিবর্তন সাধনের হাতিয়ার হিসেবেও দেখতে হবে। গান্ধীজী যে কৌশল প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন তা এমন অবস্থার সৃষ্টি করবে যেখানে হত্যা, ঘৃণা ও ভীতির বদলে ভালবাসা বা প্রেমের অবস্থার সৃষ্টি করবে। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, ভারতের জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ ও অহিংস ক্রিয়ার এক বিরাট ভূমিকা ছিল। সত্যাগ্রহ তাঁর কাছে কেবল বিদেশীরাজের বিরুদ্ধে প্রয়োগের পদ্ধতি মাত্র নয়। তাঁর কাছে সত্যাগ্রহ নামক প্রেমের নীতিটি হল শাশ্বত নীতি ('The law of satyagraha, the law of love is an eternal principle')। কিন্তু প্রেমের বাণীকে কেবল আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করলেই চলবে



না, গতিশীল এই পদ্ধতির প্রয়োগ না ঘটলে তা ব্যর্থ হয়ে পড়ে। সত্যাগ্রহ প্রকৃতপক্ষে যা কিছু অমঙ্গল, অন্যায়, অসত্য, অপবিত্র তা প্রতিহত বা প্রতিরোধ করার কৌশল (technique) এবং মানব জীবনের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত অসুবিধা দূর করার প্রচেষ্টা এবং প্রেম, স্বেচ্ছাকৃত কষ্ট, আত্মশুদ্ধিই হল এর মাধ্যম।

গান্ধীজীর আবির্ভাবলগ্ন থেকে শুরু করে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত জনজীবনে সম্প্রদায়গত, অর্থনৈতিক, সামাজিক এমন কি রাজনৈতিক বিবাদ-সংঘাতের ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহের নানা প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। সত্যাগ্রহের প্রয়োগে তিনি নিজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অথবা তাতে তাঁর পরামর্শ ছিল। এই পদ্ধতি তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে গান্ধীজী ব্যক্তি নৈতিকতা ও গোষ্ঠী নৈতিকতার মধ্যে কোন দ্বৈততা স্বীকার করেন নি। কেননা তাঁর মতে মানবসমাজকে সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও ধর্মীয় ইত্যাদি কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করা যায় না। "মানব জীবন হল এক অবিভক্ত সমগ্র। নৈতিকতা ও রাষ্ট্রনীতির সম্পর্ক হল একটির উপর অন্যটির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক। সত্য, অহিংসা প্রভতি নৈতিকগুণের কোন আবেদনই থাকে না, যদি তাদের ব্যবহারিক ও গোষ্ঠীজীবনে অনুশীলন না করা হয়।" মানবিক স্বাধীনতার উপর যে-কোনরকম হস্তক্ষেপ তিনি অহিংস পদ্ধতি দিয়ে প্রতিহত করার কথা বলেছিলেন। সত্যাগ্রহ কেন জনজীবনে সাড়া ফেলেছিল, কেন ভারতবাসী দলমত নির্বিশেষে এই কৌশল ও পদ্ধতিকে অবলম্বন করতে চেয়েছিল তার কারণ সম্ভবতঃ সেই সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতি। বিনা অস্ত্রে, খালি হাতে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করা যাবে না তা তো স্বাভাবিক, কিন্তু তাই বলে কি বিনা প্রতিবাদে বিনা প্রতিরোধে আত্মসমর্পণ করবে ভারতীয়রা? তাই হিংস্র প্রতিবাদ না জানিয়ে শুধু সত্যাগ্রহ পদ্ধতি অবলম্বনই শ্রেয়। গান্ধীজী এজন্য দেশবাসীর উদ্দেশ্যে অহিংস প্রক্রিয়ায় যোগদানের আহ্বান জানিয়েছিলেন। সত্যাগ্রহের পরিচয় দিতে গিয়ে গান্ধীজী নিজেই বলেছিলেন—এটা এমন এক আন্দোলন যা সম্পূর্ণভাবে সত্যের উপর নির্ভরশীল এবং যা হিংসাকে দূরে সরিয়ে দেয়। চারিদিকে যে হিংসার রাজত্ব তার থেকে বাঁচার একমাত্র আন্দোলন এই সত্যাগ্রহ। গান্ধীজী যেভাবে সত্যাগ্রহকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, তার থেকে একথা স্পষ্ট যে, সত্যাগ্রহের জন্য কয়েকটি আবশ্যিক বিষয় রয়েছে, এগুলো হল—(১) সত্য, (২) অহিংসা, (৩) আত্ম-পীড়ন। কেননা, এদের উপরই নির্ভর

করে আছে সত্যাগ্রহের কৌশল। এই তিনটি বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান ও তাদের সঠিকভাবে প্রয়োগের উপরই সত্যাগ্রহের কার্যকারিতা নির্ভর করে আছে। যে কোন নিরস্ত্র ও বাহ্যিক দিক থেকে অহিংস আন্দোলনকে সত্যাগ্রহ ভাবলে ভুল করা হবে।

সত্যাগ্রহের ক্ষেত্রে সত্য নির্ধারণ ও সত্যের অনুসন্ধান সমাজের বুকেই করতে হবে। সত্যের সন্ধানে রত গান্ধীজীর মনে হয়েছিল যেহেতু সত্যই সব কিছুকে ঘিরে রাখে, তাই অহিংসাও সত্যের অন্তর্গত। সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকলে হিংসার রাজত্বে বাস করেও অহিংস হয়ে থাকা সম্ভব হয়। সত্যের পূজারীকে বৃক্ষের মত সহিষ্ণু হতে হবে, ধূলিকণার মত বিনয়ী হতে হবে।

সত্যাগ্রহ সার্থকতা লাভ করে সত্য, অহিংসা ও আত্মপীড়ন (self-suffering) এর মাধ্যমে। এই আত্মপীড়নের আর এক নামই তপস্যা। যে তপস্যা ব্যক্তির মুক্তিলাভের ক্ষেত্রে আবশ্যিক, গান্ধীজী সেটিকে সামাজিক পটভূমিতে স্থাপন করেছিলেন। প্রতিপক্ষকে রূপান্তর করার জন্যই আত্মপীড়নের প্রয়োজন। তিনি বলেন, "জীবনকে ছোট করে দেখি না, তবু হাজার মানুষের বলিদানের মধ্যে যে আনন্দ তা অকল্পনীয়, কেননা সত্যাগ্রহের জন্য জীবনের বিনাশ প্রকৃত বিনাশ নয়, পরিণামে এই ত্যাগ বিশ্বকে গৌরবান্বিত করবে। আত্মপীড়ন ডেকে নিয়ে আসা বোঝা নয়, বরং যে কষ্ট আনন্দের সঙ্গে সহ্য করা যায়, তা পরিণামে অসীম ও অবর্ণনীয় সুখ দেয়।"

এই সত্যাগ্রহ কোন আলৌকিক বা অতিমানবিক পদ্ধতি নয়। স্বেচ্ছায় আত্মদহন প্রতিপক্ষের হৃদয়কেও আলোড়িত করবে বলেই গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন। আত্মপীড়ন ও প্রেমের মাধ্যমে সত্যের পরিচয় জানা যায়, বলপ্রয়োগ কখনোই নয়। এটি বলবান ও সাহসীদেরই অস্ত্র। সত্যাগ্রহের অস্ত্রেই যাবতীয় সংঘাতের অবসান হয়। এর দ্বারা দ্বন্দ্বের অবসান হতে পারে, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটতে পারে। সত্যাগ্রহকে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (passive resistence) বলা যায় না। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার, পক্ষান্তরে সত্যাগ্রহ হল উল্লেখযোগ্য এক নৈতিক হাতিয়ার, এর শক্তি নিহিত রয়েছে আত্মার শক্তির শ্রেষ্ঠত্বে। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ও সত্যাগ্রহের মধ্যে আরো প্রভেদ হল, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ভীরুদের অবলম্বন, কিন্তু সত্যাগ্রহ সাহসীদের হাতিয়ার। একজন সত্যাগ্রহী প্রেমের দ্বারাই প্রতিপক্ষের ভুল শুধরে নেবার



সুযোগ করে দেন, কিন্তু নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ক্ষেত্রে প্রেমের কোন ভূমিকাই নেই। সত্যাগ্রহ একদিকে যেমন ব্যক্তির দায়বদ্ধতা তেমনি অন্যদিকে এটি সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তব্য। কাজেই সত্যাগ্রহ একটি গোষ্ঠী ক্রিয়াও বটে। তবে ব্যক্তির অধিকার রক্ষা ও প্রতিবাদ হিসেবে একে দেখলেই চলবে না, বরং একে যৌথ রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে গণ্য করতে হবে, যার উদ্দেশ্য হল অনিষ্টকর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটানো।

গান্ধীজী মনে করতেন, অন্যায় ও অমঙ্গলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এক আবশ্যিক কর্তব্য। তাই সরাসরি প্রতিরোধ জানানোকেই তিনি শ্রেয় পথ বলে মনে করে ঘোষণা করেছিলেন 'Never has anything been own on this earth without direct action'। এই অহিংস প্রতিরোধ যে ভীরুদের জন্য নয় তা তিনি বারবার ঘোষণা করেছেন। সত্যাগ্রহকে গান্ধীজী এক ধরনের নৈতিক যুদ্ধ বলে মনে করেন। যুদ্ধ প্রক্রিয়া ও সত্যাগ্রহ প্রক্রিয়ার সঙ্গে কয়েকটি বিষয় মিল আছে। যেমন—(ক) দুটিই সামাজিক ক্রিয়া যার লক্ষ্য হল সামাজিক সংঘাত বা সংঘর্ষের মীমাংসা। (খ) দুটি ক্ষেত্রেই আলাপ আলোচনা ব্যর্থ হলে ও মীমাংসাসূত্র না পাওয়া গেলে তবেই ওই প্রক্রিয়ার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। কিন্তু সত্যাগ্রহ ও যুদ্ধের এই মিলটুকু থাকলেও দুটিকে অভিন্ন বলা যায় না। কেননা যুদ্ধের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করা হয়ে থাকে, কিন্তু সত্যাগ্রহে আলাপ-আলোচনা বা বোঝানোর চেষ্টা থাকে।

সত্যাগ্রহ বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয়, যেমন— অসহযোগিতা (Non co-operation), আইন অমান্য (civil disobedience) ইত্যাদি। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সত্যাগ্রহের এই দুটি আকারেরই প্রয়োগ ঘটেছিল। কিন্তু এছাড়াও অসহযোগিতার মধ্যে রয়েছে ধর্মঘট, হরতাল, বয়কট, পদত্যাগ ইত্যাদি। সহযোগিতা করা সত্ত্বেও যদি অত্যাচার ও শোষণ সহ্য করতে হয়, তাহলে সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতাই শ্রেয়, কেননা তাহলেই সরকারী কাজকর্ম ব্যাহত হবে। হরতাল ইত্যাদির দ্বারা যে অসহযোগিতা দেখানো হয় তা হল কাজকর্ম বন্ধ করে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়। হরতাল যথার্থভাবে কার্যকরী হতে পারে যদি তা স্বেচ্ছাকৃত ও অহিংস হয়। এছাড়া বয়কট ও পিকেটিংকেও অসহযোগিতার অন্তর্গত করা যায়। 'আইন অমান্য করা' সত্যাগ্রহের আর একটি রূপ যা গান্ধীজীর মতে, সম্পূর্ণ কার্যকরী রক্তপাতহীন

বিদ্রোহ এবং সশস্ত্র বিদ্রোহের বিকল্প (a complete, effective and bloodless substitute of armed revolt)। এটি এক ধরনের অহিংস বিদ্রোহ। রাষ্ট্রের অনৈতিক আইন না মানা, কর্তৃপক্ষের আইনের কর্তৃত্ব অস্বীকার, যেমন—ট্যাক্স না দেওয়া ও দৈনন্দিন জীবনে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব স্বীকার না করা ইত্যাদি। রাষ্ট্রের অযৌক্তিক আইনকে অমান্য করার ফলে সরকার ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য হবে। কিন্তু আইন অমান্যের কাজে যেমন শক্তি প্রয়োগ করা চলবে না, তেমনি তার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা হলে তার প্রতিরোধ করাও চলবে না। সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছায় কারাবরণ পর্যন্ত করবেন। অনশন এমনকি আমৃত্যু অনশনের যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব বোঝাতে গান্ধী বলেন—'আমি এই সিদ্ধান্তেই আসতে বাধ্য হয়েছি যে, আমরণ অনশন সত্যাগ্রহ পরিকল্পনার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং এটি মহত্তম ও একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে অস্ত্রাগারের সব থেকে কার্যকরী অস্ত্র'। অনশন কেবল ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রেই কার্যকরী কিন্তু গোষ্ঠী বা সমষ্টিগত প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তা মারাত্মক। সত্যাগ্রহের আর একটি রূপ হল ধর্মঘট। তবে 'ধর্মঘট' শব্দটিকে গান্ধীজী সাধারণ অর্থে গ্রহণ করেননি। ধর্মঘট স্বেচ্ছাকৃত বিশুদ্ধ পীড়ন যার দ্বারা ভ্রান্ত প্রতিপক্ষকে রূপান্তর করা যায়। ধর্মঘটী পরিষ্কারভাবে তাদের ন্যায্য দাবী এমনভাবে পেশ করবে যা মেনে নেওয়া পুঁজিপতির পক্ষে সম্ভব হয়।

## অছিগিরির নীতি
## (Trusteeship)

গান্ধীজীর রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনে এই অছিগিরি নীতিটির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল যে অহিংসার পথে স্বাধীনতা লাভ করতে হলে সামাজিক অসাম্য দূর করতে হবে। আর বিভিন্ন অসাম্যের মধ্যে অর্থনৈতিক অসাম্য নিয়ে তিনি বেশী উৎকণ্ঠিত ছিলেন। আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সবার আগে দরকার মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে যে বিরোধ চলে আসছে তা দূর করা। অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করতে হলে প্রথমেই যেটি জরুরী তা হল বিষয়সম্পত্তির মালিকানা বদল করা। প্রাচ্যে ঋক্‌বেদের সময় থেকে এবং পাশ্চাত্যে গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর কাল থেকে অতি আধুনিক কাল পর্যন্ত বিষয়-সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত সমস্যা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসে পৌঁছেছে। এই সুদীর্ঘ সময়ে সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মালিকানার মূল্য



ও আদর্শ সম্পর্কে বিভিন্ন মত, ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গলের জন্য তাদের কিভাবে প্রয়োগ করা যায়, প্রকৃত মালিক কি কি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে, তাঁর অধিকার কতটুকু, তাঁর কর্তব্যই বা কি কি—এই জাতীয় প্রশ্নের আমরা বিভিন্ন রকমের উত্তর শুনে আসছি। সমাজের পরিবর্তনের একটি স্তরে পুঁজিবাদের আবির্ভাব ঘটল। এই পর্বে এসেই বিষয়-সম্পত্তি বা ধনসম্পদের ধারণায় একটি আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের হাতে ধনসম্পদের মালিকানা থাকায় যদিও উৎপাদন ব্যবস্থায় অনেক উন্নতি ঘটলো, কিন্তু এর মধ্যেই নিহিত ছিল নানা ধরনের সামাজিক অসাম্য ও অবিচারের বীজ। দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা, শ্রমিক শ্রেণীর জীবনে নানাধরনের অর্থনৈতিক সমস্যা, নিরাপত্তা বোধের অভাব ইত্যাদি লক্ষ্য করা গেল। মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষ অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক মানসম্মান, মর্যাদা, সুযোগ-সুবিধা ও ক্ষমতা ভোগ করতে থাকল।

এরপর বিবর্তনের পথে সমাজের বুকে জন্ম নিল সমাজতন্ত্রবাদ। সমাজতন্ত্রবাদীরা দেখালেন যে সামাজিক অসাম্য ও অনৈক্যের মূল হল অর্থনৈতিক অসাম্য। কার্ল মার্কসই প্রথমে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শুধু সম্পত্তিরই নয় সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামোতেই পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করলেন। মার্কসের এই ভাবনা ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে সমস্ত চিন্তাবিদদের যেন নতুন পথের দিশা দেখালো। এই অসাম্য দূর করার মার্কস প্রস্তাবিত পন্থাগুলোও মোটামুটিভাবে গৃহীত হতে লাগল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতেই আর্থিক সমস্যার উৎস সম্পদের পুঁজিবাদী বন্টনব্যবস্থায় ধীরে ধীরে মানুষ বিশ্বাস ও আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল।"এই রকম সময়ে অবলুপ্ত সামন্তযুগের চিন্তাধারাকে যেন পুনরুজ্জীবিত করে তাঁর অভিভাবকত্বের নীতি নিয়ে গান্ধীজী যখন এগিয়ে এলেন, তখন বুদ্ধিমান কম লোকই তাঁর কথায় কর্ণপাত করেছেন। কিন্তু ধর্মের ও নীতির যে আবেগ দিয়ে তিনি তাঁর কথা প্রচার করলেন তা ভারতীয় জনসাধারণের মনে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করল, কারণ এখনও ধর্মের ও নীতির কথা ভারতীয়দের মনকে নাড়া দেয়। আরো লক্ষ্যণীয় যে 'উদীয়মান' ধনীদের চেয়ে বনেদী ধনীদের উপরই এই নীতি বেশী প্রভাব বিস্তার করে এবং কিছু কিছু লোক গান্ধীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে" (দান্তেওয়ালা—গান্ধীবাদের পুনর্বিচার, পৃঃ-৩৮)।

এখানে প্রথমেই বলে রাখা দরকার যে, পুঁজিবাদের অন্যায় ও অসমর্থনীয়

ভিত্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্যই গান্ধীজী অছিগিরির নীতি প্রবর্তনের দাবী জানান। গান্ধীজীর অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় এই নীতিটির একটি সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। এটি তাঁর কাছে এমন এক জীবনাদর্শ যার ভিত্তি রয়েছে সনাতন ভারতীয় চিন্তা ও গ্রন্থের মধ্যে। উপনিষদ ও গীতার আদর্শের সঙ্গে তিনি ইংরেজ আইনের জ্ঞানকে সমন্বিত করে এই নীতির প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাই একথা মনে করলে অত্যন্ত অন্যায় হবে যে, গান্ধীজীর কাছে এই নীতি একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা বা এটি তাঁর একটা ছদ্মবেশ। তিনি বলেন—"আমার অছিগিরি তত্ত্ব কোন অস্থায়ী ব্যবস্থা নয়, নিশ্চিতভাবেই কোন ছদ্মবেশ নয়... এর পিছনে দর্শন ও ধর্মের অনুমোদন রয়েছে।" এই প্রসঙ্গে প্যারেলালের লেখা 'Mahatma Gandhi—The Last Phase' গ্রন্থের এই অংশটুকু উল্লেখ করা যায়—'গান্ধীজীর 'অছিগিরি' মতবাদটি নির্ভর করে রয়েছে ঈশোপনিষদ নামে প্রাচীন হিন্দু দার্শনিক গ্রন্থের একটি প্রসিদ্ধ উক্তিতে। উক্তিটি হল—'এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা ঈশ্বরের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। প্রথমে ত্যাগ কর, যা পরিণামে ভোগ করতে পার। অন্যের সম্পদে লোভ বা আকাঙ্খা করবেনা।"

প্রতিটি ব্যক্তির সৎ ও অহিংস পথে অর্জিত ব্যক্তিগত সম্পত্তি পরিত্যাগের কথা গান্ধীজী বলতেন। যেহেতু যে-কোনও ব্যক্তিই তার তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তার থেকে বেশী সম্পত্তি খুব সহজে অন্যকে দেবার ব্যাপারে রাজী হয় না, তাই সম্পত্তির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটানোর কথা গান্ধীজী বারে বারেই ঘোষণা করেছেন। নিজেদের সম্পত্তির মালিক হিসেবে না ভেবে সম্পত্তির 'অছি' (Trustee) হিসেবে ভাবতে শিখতে হবে। নিজের মঙ্গল বা কল্যাণের জন্য নয়—জনসাধারণের স্বার্থেই সম্পত্তির ব্যবহার করতে হবে। সকলেই যদি তাঁদের নিজেদের সম্পত্তির মালিক না ভেবে কেবলমাত্র অছি হিসেবে নিজেদের গণ্য করেন, তাহলে অচিরেই অর্থনৈতিক সাম্য আসবে এবং সম্পদেরও ন্যায়সম্মত বিতরণ সম্ভব হবে। তিনি তাই বলেন—'সমবন্টন হল আমার আদর্শ; কিন্তু যতক্ষণ না তা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে ততক্ষণ আমি ন্যায়সঙ্গত বন্টনের জন্য কাজ করব'। তিনি মনে করেন আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠার অর্থ ধনী ও শ্রমিকের চিরন্তন বিরোধের অবসান ঘটানো। এর দ্বারা বুঝতে হবে দেশের অধিকাংশ ধনসম্পদ যে মুষ্টিমেয় ধনীদের হাতে জমা হয়ে আছে তা অপেক্ষাকৃত নীচের স্তরে নামিয়ে আনতে হবে এবং দেশের কোটি কোটি ক্ষুধা-



পীড়িত নরনারীকে অপেক্ষাকৃত উপরের স্তরে উঠিয়ে আনতে হবে। মুষ্টিমেয় ধনী ও কোটি কোটি ক্ষুধার্ত নরনারীর মধ্যে এই বিরাট ব্যবধান দূর না হলে অহিংস শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা একেবারেই অসম্ভব।...দরিদ্র সেখানে শ্রেষ্ঠ ধনীর সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ করবে। ধনীরা যদি তাদের ধন ও তজ্জনিত ক্ষমতা স্বেচ্ছায় ত্যাগ না করেন এবং জনসাধারণের কল্যাণের জন্য তা ব্যবহার করতে প্রস্তুত না হন তবে রক্তাক্ত হিংস্র বিপ্লব একদিন অবশ্যম্ভাবীরূপে এসে উপস্থিত হবে। "ধনীরা সমাজের 'অছি' বা ট্রাষ্টী স্বরূপ থাকবেন, আমার এই মত অনেকে উপহাস করেছেন, তবুও আমি এই মতে আজও বিশ্বাসী, আমি জানি একাজ সম্পন্ন করা কত কঠিন। অহিংসাকেও কার্যে পরিণত করা সহজ ব্যাপার নয়।"[১]

একজন সমতাবাদী হিসেবে তাঁর আদর্শ ছিল ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধানটুকু যতটা সম্ভব কমিয়ে নিয়ে আসা। তিনি বুঝেছিলেন যে সকলের সঙ্গে একেবারে সমান করে ফেলা এক অসম্ভব কল্পনা। তাই তিনি চেয়েছিলেন অর্থনৈতিক সাম্য। তবে এর দ্বারা তিনি একথা বোঝাতে চাননি যে সকলেরই সমান পরিমাণ জাগতিক সম্পদ থাকবে। প্রত্যেকের অন্ততঃ একটি বাসযোগ্য গৃহ থাকবে, পর্যাপ্ত খাদ্য থাকবে, নিজেদের আচ্ছাদনের পর্যাপ্ত খাদি থাকবে। এর দ্বারা আরো বোঝায়, যে-নিষ্ঠুর অনৈক্য আজকের দিনে সমাজে একটি বিষ-ফোড়ার মত রয়েছে, তাকে সম্পূর্ণ অহিংস পথেই দূর করতে হবে।

অছির ধারণা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এবং অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে গান্ধীজী কখনো পুঁজিবাদী ও জমিদারদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কথা বলেননি। বরং সম্পত্তি সম্পর্কে তাঁদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিলেন। শ্রমিক ও কৃষকদের 'অছি' (Trustee) হিসেবে তাঁদের কাজ করার দাবী জানিয়েছিলেন। শ্রমিক ও কৃষকদের জীবনধারা নিয়ে পুঁজিপতি ও জমিদারদের সঙ্গে তাদের যে একটা বিশাল ব্যবধান রয়েছে, তা যতখানি সম্ভব কমিয়ে আনতে হবে। এমন একটি সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যেখানে কোন শ্রেণীবিরোধিতা থাকবে না, বরং থাকবে শ্রেণীসংহতি ও শ্রেণীসমন্বয়। সেখানে প্রত্যেকে নিজ নিজ সাধ্য ও সামর্থ্য অনুসারে কায়িক পরিশ্রম করবে, ফলে শোষণ বলে কিছু থাকবে না। জমির মালিক ও পুঁজিপতিরা সমাজের কল্যাণের জন্য তাঁদের প্রতিভা ও সম্পদের ব্যবহার করবেন। যদি জমির মালিক

১। বিধুভূষণ দাশগুপ্ত অনুদিত 'দেশগঠনের কর্মসূচী ও গান্ধী'; পৃঃ-৩৮-৩৯।

ও পুঁজিপতিরা এইসব শ্রমিক ও কৃষকদের অছি হিসেবে দায়িত্ব নিতে অনিচ্ছুক হন তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার নীতি প্রয়োগ করতে হবে।

অছিগিরির নীতি গান্ধীজী কেন সমর্থন করেন তা অধ্যাপক নির্মল কুমার বসুর সঙ্গে তাঁর এক সাক্ষাৎকারে ধরা পড়ে। তিনি সেখানে বলেন—"যাদের অর্থ আছে, এখন থেকে তাদের সম্পদকে দরিদ্রদের অছি হিসেবে গণ্য করতে হবে। একে হয়ত একটা আইনসম্মত কল্পনা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যদি জনগণ বারবার চেষ্টা করেও এ বিষয়ে ভাবে এবং সেই মতো কাজ করে তাহলে এই জগতে আমাদের জীবন প্রেম ও ভালবাসার দ্বারাই পরিচালিত হবে। ইউক্লিডের বিন্দুর (point) সংজ্ঞার মত চরম অছির ধারণা বিমূর্তকরণ ছাড়া কিছু নয় এবং তা সম্পূর্ণ অলভ্য। কিন্তু যদি আমরা এর জন্য প্রয়াস চালাই তাহলে অন্য যে কোন পদ্ধতির চেয়ে সাম্যের অবস্থার দিকে আরো এগিয়ে যাব।"

ওই সাক্ষাৎকারেই গান্ধীজীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্থানে রাষ্ট্রের মালিকানা স্বীকারে আপত্তি কোথায়? উত্তরে গান্ধীজী মেনে নিয়েছিলেন যে ব্যক্তিগত মালিকানার চেয়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানা নিশ্চয়ই উন্নততর। কিন্তু যেহেতু রাষ্ট্রীয় মালিকানার ক্ষেত্রে হিংসার আবির্ভাব সম্ভব, তাই রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আপত্তি। তিনি বেশ জোরের সঙ্গেই বলেন যে "রাষ্ট্র যদি সহিংস পথে ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদকে দমন করে, তাহলে রাষ্ট্রকেও সহিংসব্যাধি আক্রমণ করতে পারে এবং ফলে কোন সময়েই আর অহিংসার প্রসার সম্ভব হবে না। রাষ্ট্র কেন্দ্রীভূত ও সংগঠিত রূপেই হিংসার প্রকাশ ঘটায়। ব্যক্তির আত্মা বা হৃদয় থাকে, কিন্তু রাষ্ট্র একটি হৃদয়হীন যন্ত্র। তাই তা কখনো হিংসামুক্ত হতে পারে না কেননা তার অস্তিত্বই নিহিত রয়েছে হিংসার মধ্যে। তাই আমি অছি মতবাদকেই সমর্থন করি।"[১]

উপনিষদের 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিতা' (অর্থাৎ ত্যাগের মাধ্যমেই ভোগ করো) নীতি গান্ধীজীর অন্তরে কতখানি প্রভাব ফেলেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন তিনি সেবাসঙ্ঘের এক সদস্যের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন—"উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা আমি অনেক সম্পত্তি করেছি, কিন্তু আমাকে বুঝতে হবে যে এগুলো সব আমার নয়। আমার যাতে অধিকার আছে তাহল একটা সম্মানজনক জীবনযাপনের অধিকার এবং সেটি লক্ষ লক্ষ মানুষ

১। তদেব।



যেমনভাবে যাপন করে তার থেকে উন্নততর কিছু নয়। আমার সম্পদের অবশিষ্টাংশ হল জনসাধারণের এবং তা জনসাধারণের কল্যাণ বা মঙ্গলার্থে ব্যয় হওয়া উচিত। শাসকশ্রেণী, জমিদার ও সুবিধাভোগী শ্রেণীদের মধ্য থেকে লোভ ও সম্পদের অধিকার সম্পর্কিত ধ্যানধারণা বদলাতে হবে। তাদের সম্পদ থাকা সত্ত্বেও মাথার ঘাম পায়ে ফেলা মজুরদের স্তরে নামিয়ে আনতে হবে।"[১]

'কতজন প্রকৃত অর্থে অছি হবে' এই প্রশ্ন গান্ধীজীর কাছে গুরুত্বহীন বলে মনে হয়েছে। যদি মতবাদ হিসেবে এটি সত্য হয়; তাহলে অনেক লোক এই নীতি মেনে চলছেন, না একজন মেনে চলছেন?—এই প্রশ্ন কোনমতেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। গান্ধীজীর ট্রাষ্ট মালিকানার মূলকথা হল, "ব্যক্তি নিজে যত কিছু সংগ্রহ করে তাঁর পক্ষে নিজেকে তার অভিভাবক বা অছি বিবেচনা করা কর্তব্য। তখন সম্পত্তির বা আয়ের কতখানি সে নিজের জন্য রাখবে তা আর তার খেয়াল খুশীর উপর নির্ভর করে না...দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুসারে সর্বোচ্চ আয়ের পরিবর্তন যখন সম্ভব তখন ধরাবাঁধা সর্বোচ্চ বরাদ্দের পরিবর্তে এইভাবে সীমা নির্ধারণ করা অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত।"[২]

অভিভাবক বা অছিকে নিম্নোক্ত বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। "প্রথমতঃ পুঁজিতান্ত্রিক মালিকের মত অভিভাবক ধনসম্পদ ব্যবহার বা অপচয়ের অধিকারী নয়। কেবলমাত্র নিজের জীবনধারণের উপযোগী অংশটিতেই তার প্রকৃত অধিকার। আর এই অংশটির সর্বোচ্চ সীমা রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত হবে। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে। উভয় পরিকল্পনারই মূল তাৎপর্য এই যে, সম্পত্তি অর্থাৎ উৎপাদনের যন্ত্রপাতিগুলো কোন বিশেষ ব্যক্তির সম্পত্তি বা তার নিয়ন্ত্রণাধীন বিবেচিত হবে না। সমাজের প্রয়োজন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতি অনুসারে এই সম্পত্তি নিয়ন্ত্রিত হবে।"

**মূল্যায়ন ঃ** সামাজিক অসাম্য ও অনৈক্য দূর করার জন্য গান্ধীজীর অছিগিরির নীতি যে খুবই চিত্তাকর্ষক এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। যদি পুঁজিপতিরা অছি হিসেবে কাজ করতে না পারে তাহলে সরকারের উচিত তাদের কলকারখানা বা শিল্প-বাণিজ্য অধিগ্রহণ করা। কেবলমাত্র লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে নয় মানবসমাজের কল্যাণের জন্যই এইসব শিল্প পরিচালিত হবে।

১। দান্তেওয়ালা—গান্ধীবাদের পুনর্বিচার; পৃঃ-৪১।
২। তদেব।

সরকারের সঙ্গে সঙ্গে যতদূর সম্ভব শ্রমিকদেরও পরিচালনায় একটি অংশ দিতে হবে। বিকেন্দ্রীকরণের অবশ্যই প্রয়োজন আছে; কেননা কেন্দ্রীকরণ ও বৃহদায়তন উৎপাদন গণতন্ত্রের শত্রু হিসেবে বিবেচিত। গান্ধীজী আরো মনে করতেন যে অহিংস নীতি ও কেন্দ্রীয়গত বাণিজ্য একসঙ্গে থাকতে পারে না, ব্যক্তিগত হিংসা ও রাষ্ট্রীয় হিংসার মধ্যে নির্বাচন করতে হলে গান্ধীজী প্রথমটিকেই বেছে নিতে চাইবেন, কেননা তাঁর মতে—"The state represents violence in a concentrated and organised form. The individual has soul, but the state is a soulless machine...hence I prefer the doctrine of trusteeship"...।

'অছিগিরি' নীতি হিসেবে যতই চিত্তাকর্ষক হোক না কেন, এর বাস্তব প্রয়োগ ঘটানো কিন্তু খুব সহজ সাধ্য নয়। দীর্ঘদিন ধরে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা বিষয়-সম্পত্তিতে ভোগাধিকার থাকবে না, থাকবে শুধু অভিভাবকের অধিকার এই বিষয়টি সহজে ভূ-স্বামীরা মেনে নেবেন না। গান্ধীজী এই নীতিটির বাস্তব প্রয়োগ ঘটানোর সাধ্যমত প্রয়াস চালালেও কালক্রমে দেখা গেছে যে এটি উত্তরাধিকার বিলোপ নীতিতে পরিণত হয়েছে। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু মন্তব্য করেছেন যে, "যদি উত্তরাধিকারই চলে যায় তাহলে সম্পত্তিবান শ্রেণী গঠন যে প্রধান স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে তাও অদৃশ্য হয়ে যায়।" যদি মানবিকীকরণ প্রক্রিয়ার জন্য অছিগিরি সমর্থনযোগ্য হয় তাহলে বলা যায় যে, সম্পত্তির সামাজিকীকরণ হল বাস্তবে এইরকম রূপান্তর ঘটার মৌল পূর্বশর্ত। যেখানে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে সেখানে সামাজিকীকরণ একটা শূন্যগর্ভ প্রত্যয় ছাড়া আর কিছু নয়।

আসলে গান্ধীজীর অছিগিরি সম্পর্কিত মতবাদ এমন কতকগুলো মৌলিক স্বীকৃতির উপর দাঁড়িয়ে আছে, যেগুলো মেনে নিতে অনেকেই কুণ্ঠাবোধ করতে পারেন। যদি এর আশ্রয় বাক্যগুলোকে, স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলেই নীতিটির সম্পূর্ণতা ও সংহতি রক্ষা হবে। যে দৃষ্টিকোণ থেকে গান্ধীজী এই নীতিটির প্রবর্তন চেয়েছিলেন সেই দৃষ্টিকোণটুকু অনুধাবন করতে পারলে গান্ধীজীর অবস্থানটিকে বোঝার কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু মৌল স্বীকৃতিগুলোকে যদি কেউ অস্বীকার করেন, তাহলে আর নীতিটি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না।

অছিগিরি নীতিটির উপস্থাপন এবং ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একটি সুন্দর মন্তব্য



উল্লেখযোগ্য—"বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের পদ্ধতি হিসেবে এই মতবাদটির কার্যকারিতা ও ব্যবহারিক প্রয়োগক্ষমতায় কেউ বিশ্বাস করতে পারেন অথবা অবিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু যে কেউ বুঝতে পারবেন যে, কেন গান্ধীজী-পরিকল্পিত সমাজে পরিবর্তন সাধনের জন্য অথবা নতুন রূপ (New order) সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রের শক্তি ও কর্তৃত্বের উপর নির্ভর করা যায় না।"

এই নীতির সমালোচনায় যে মূলকথাটির উপর সকলে জোর দিতে চান তাহল সমাজের মৌল পরিবর্তনের কার্যকরী পন্থা হিসেবে এটিকে গ্রহণ করা যায় না। মার্কসবাদীরা অছিগিরির অর্থ করেন শ্রেণীসমন্বয় (class collaboration) বা শ্রেণী ঐক্য। কেবল মার্কসপন্থীরাই নয়, জে. জে আন্তারিয়া, টি.কে. এন উন্নিয়ন, এমনকি জহরলাল নেহেরু পর্যন্ত অছির কার্যকারিতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। অছির সমর্থনে যাঁরা সামাজিক সম্পর্কের মানবায়নের উদ্দেশ্যর উপর গুরুত্ব দেন, তাঁদের বিরুদ্ধে বলা যায়, সামাজিক সম্পর্কের মানবায়ন নয়, বরং সম্পত্তির সামাজিকীকরণ গান্ধীজী-অভিপ্রেত সামাজিক পরিবর্তনের পূর্ব শর্ত।

## অনুশীলনী

১। মহাত্মা গান্ধীর মানুষ সম্পর্কিত ধ্যানধারণার পরিচয় দাও।
২। 'অহিংসা' নামক প্রত্যয়টি গান্ধীজীকে অনুসরণ করে ব্যাখ্যা করো।
৩। মহাত্মা গান্ধীর 'সত্যাগ্রহ' নামক প্রত্যয়টি বিশ্লেষণ করো।
৪। 'অছি' বলতে কী বোঝায়? গান্ধীজীর রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনে অছির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।
৫। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ ঃ
(ক) অহিংসার বিভিন্ন প্রকার
(খ) সত্য ও অহিংসার সম্পর্ক
(গ) সত্যের স্বরূপ
(ঘ) সত্যাগ্রহের বিভিন্ন প্রভাব
(ঙ) অছির ভূমিকা।